জনারণ্যে পদাতিক

AMONGST THE COMMON PEOPLE

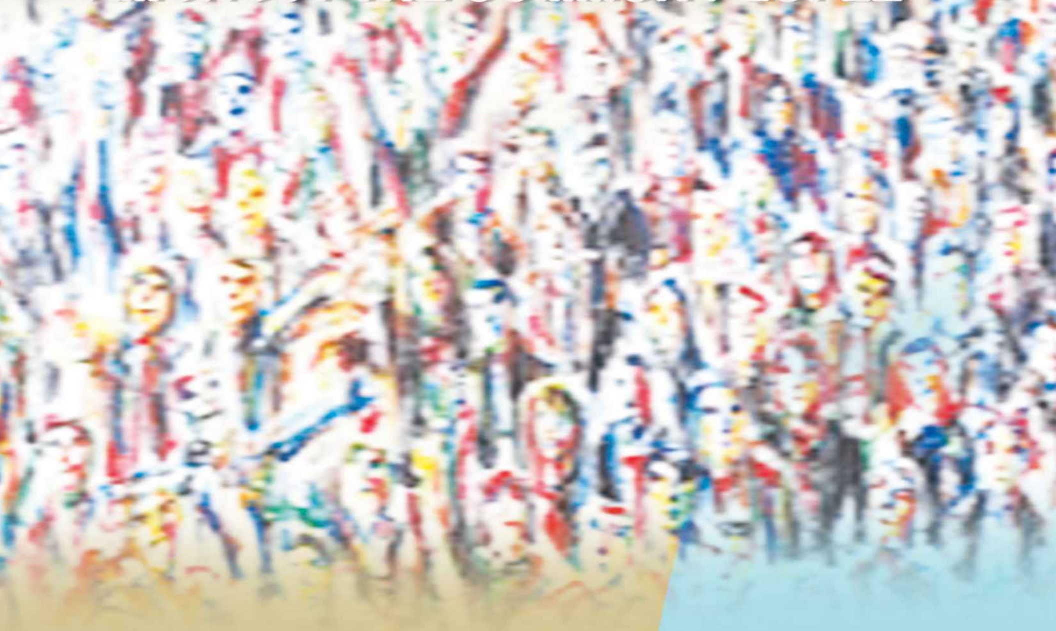

ডা. তপনকুমার বিশ্বাস

Dr. Tapan Kumar Biswas

জনারণ্যে
পদাতিক

জনারণ্যে পদাতিক

ডা. তপনকুমার বিশ্বাস
Dr. Tapan Kumar Biswas

প্রকাশনী

জনারণ্যে পদাতিক

ডা. তপনকুমার বিশ্বাস

Jonaranye Padatik
(A collection of Bengali Poems)
Dr. Tapan Kumar Biswas

Mob. 9433125195

গ্রন্থস্বত্ব

ডা. দীপালী বিশ্বাস

সরোজ পার্ক, বারাসাত, কলকাতা - ৭০০১২৪

Copy Right
Dr. Dipali Biswas
Saroj Park, Barasat, Kolkata - 700124

প্রকাশক

ডা. তপন কুমার বিশ্বাস

সরোজ পার্ক, বারাসাত, কলকাতা - ৭০০১২৪

প্রথম প্রকাশ ঃ ৮ই জুলাই ২০১৯

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখকের অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশের কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোন তথ্য কোনভাবেই সংরক্ষণ, প্রকাশ বা ব্যবহার করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রচ্ছদ ঃ

ডা. তপনকুমার বিশ্বাস

আই এস বি এন ঃ ৯৭৮-৯৩-৫৩৬১-৪৭১-৩

ISBN : 978-93-5361-471-3

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রক

মহামায়া প্রেস অ্যান্ড বাইন্ডিং, ২৩ মদনমিত্র লেন, কলকাতা -৭০০০০
ফোন ঃ ০৩৩-২৩৬০ ৪৩০৬

প্রাপ্তিস্থান

তুহিনা প্রকাশনী, ১২ সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ফোনঃ ৯১২৩৮৩৯২৬৭
প্রিন্ট ও বুকস্, ৩৪, বেনিয়াটোলা লেন,কলকাতা-৭০০০০৯
আদি পাল ব্রাদার্স, কে কে মিত্র রোড, বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৪

মূল্য ঃ ১০০ টাকা

উৎসর্গ

আমার সর্বক্ষণের উৎসাহের উৎস
নন্দিনী
ডা. দীপালী বিশ্বাস-কে

ভূমিকা

'জনারণ্যে পদাতিক' ডা. তপনকুমার বিশ্বাসের চতুর্থ গ্রন্থ। ডা. তপনকুমার বিশ্বাসের যতগুলো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সবগুলিরই প্রারম্ভিক মুখবন্ধ আমার লেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তার পূর্বের লেখা তিনটি গ্রন্থের মধ্যে দুটি কবিতাগ্রন্থ 'ফিরে আসা' ও 'জেগে আছি' এবং তৃতীয়টি ভ্রমণকাহিনী – 'মিশর-মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে' সকল পাঠকের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

এবারের 'জনারণ্যে পদাতিক' একটি কবিতা গ্রন্থ। এই গ্রন্থের নামকরণের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে কবিতাগুলির মর্মার্থ, ভাব ও কথা। প্রেম, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে চিরাচরিত সম্পর্ক ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়। এই কবিতার বইটির মধ্যে অনেকগুলি কবিতা যেমনঃ জনারণ্যে পদাতিক, আদেশনামা, শিকড়ের আমন্ত্রণ, মুক্ত লোকালয়, শত নাম, স্পর্ধা, কবিতা ও কনফারেন্স, কালো খাম, সূর্য ও সুতপা উপাখ্যান, মোহমুক্তির সাগরবেলায়, জলজ ইচ্ছে, ওদের কথা, অরণ্যে, অন্ধকার দর্শন, হিমেল কুয়াশায়, প্রাণহীন নুড়ি পাথর, একালের অর্জুন, বিলাসী তপস্যা, নিরন্তর, চেতনার চৌহদ্দিতে, রথিন বইমেলায়, অন্য ক্যানভাসে, গ্লেসিয়ার পর্বতে, রুমাল, সৌখিন আশ্রয় সহ বেশ কিছু কবিতার স্বাদ একেবারে অন্যরকম। 'জনারণ্যে পদাতিক' কবিতা গ্রন্থটি সকল পাঠককে পড়ার অনুরোধ রাখলাম।

আগামীতে ডা. তপনকুমার বিশ্বাসের ভিন্ন স্বাদের লেখার জন্য অপেক্ষা করছি। কাজ এগিয়ে চলেছে-এটুকুই বললাম। সহৃদয় পাঠক আগ্রহে থাকুন।

ডা. তপনকুমার বিশ্বাসের জন্মদিনে (৮ই জুলাই) তার এই জনারণ্যে পদাতিক গ্রন্থখানির প্রথম প্রকাশ তার সকল গুণমুগ্ধ পাঠকের জন্য আনন্দবহ ঘটনা হয়ে থাকবে আশা করি।

ধন্যবাদান্তে–

ডা. দীপালী বিশ্বাস
সরোজ পার্ক, বারাসাত
কলকাতা - ৭০০১২৪
৮ই জুলাই ২০১৯

সূচিপত্র

১। আদেশনামা ৯
২। শিকড়ের আমন্ত্রণ ১১
৩। জনারণ্যে পদাতিক ১৩
৪। মুক্ত লোকালয় ১৫
৫। শত নাম ১৬
৬। স্পর্ধা ১৮
৭। কবিতা ও কনফারেন্স ২০
৮। কালো খাম ২২
৯। মোহমুক্তির সাগরবেলায় ২৪
১০। অন্ধকার দর্শন ২৫
১১। ওদের কথা ২৭
১২। সূর্য ও সুতপা উপাখ্যান ২৯
১৩। চোখের জলের ছবি ৩১
১৪। গল্পের বৃত্ত ৩২
১৫। দূর্বাঘাসের কার্পেটে ৩৪
১৬। রাত মৃগয়া ৩৬
১৭। চৈতন্যে ফিরে যায় ৩৭
১৮। বিশ্বাসী রাত ৩৮
১৯। মানুষে ঈশ্বরে কথা ৩৯
২০। রাধা ৪০
২১। আকাঙ্ক্ষা ৪২
২২। একটি ছোট গল্প লেখা যেত ৪৪
২৩। সুন্দরের স্বরলিপি ৪৫
২৪। পাঁচিল ৪৬
২৫। প্রিয় গিটার ৪৭
২৬। কবিতা স্বপ্ন ৪৮
২৭। একবারের কবিতা ৪৯
২৮। কোমল অন্ধকার ৫০
২৯। কিশোরীর ডুব সাঁতার ৫১
৩০। খোলা চিঠি ৫২
৩১। লুম্বিনী ৫৪
৩২। অবিরাম স্রোতধারায় ৫৫
৩৩। শ্রাবণের পরে ৫৬
৩৪। অনিশ্চয় ৫৮
৩৫। কবি যখন ঈশ্বর ৬০
৩৬। একটি দিনের অবসানে ৬১
৩৭। গতি ৬৩
৩৮। মিষ্টি মউ ৬৫
৩৯। খেয়ালি মন ৬৭
৪০। সংসার সিঁড়ি ও মরুভূমি ৬৮
৪১। ভ্যালেন্টাইন ও বইমেলা ৬৯
৪২। সম্রাট ৭১
৪৩। প্রাণহীন নুড়ি পাথর ৭২
৪৪। রথীন বইমেলায় ৭৪
৪৫। গ্লেসিয়ার পর্বতে ৭৬
৪৬। রুমাল ৭৭
৪৭। ঘৃণা ৭৯
৪৮। ছিন্নপত্রে ৮০

আদেশনামা

মুক্তি চেয়েছিলাম ক্ষণিকের
দায়িত্ব থেকে অবসরের
কে যেন এসে বিশ্রামে পাঠাল কিছুক্ষণ।
তখন আমি একা
খোলা মাঠে অনুচরবিহীন একা
ঘাসের বিছানায় শিশিরে পিঠ রেখেছি
চোখ মেলেছি আকাশের দিকে
খোলা বুকের ঘামে তখন শীতল বাতাসের লুকোচুরি।

গতি কমাতে চাইলাম এবার—
চেয়েছিলাম, তুমি আপেল কেটে সামনে ধরবে বিকেলে
একান্তে সন্ধ্যায় তোমার হাতের গরম কফি
রবিঠাকুরের কবিতা শোনাবে ঘরের আলো নিভিয়ে
সারা পাড়া ঘুমিয়ে যখন।

একই স্বাক্ষরের নতুন নির্দেশ এল
ঘোড়া ছোটাও অন্য মাত্রায় অন্য পথে
ভিন্ন গতিতে ভিন্ন পর্বতে।
ঘোড়ার খুরে জ্বলে ওঠে স্ফুলিঙ্গ
আবার ছুটে চলা—কাজ আর কাজ।
নতুন আদেশনামায়—
শরীরের পেশিতে জ্বেলে দেয় আগুন
মস্তিষ্কের কোষে ছড়িয়ে দেয় বিদ্যুৎ।
এক পথ থেকে অন্য পথে

এক বৃত্ত থেকে অন্য বৃত্তে
প্রলয় থেকে মহাপ্রলয়ে
ছুটে চলা বিরামহীন- গতি আর গতি।

মনে রেখ,
তোমার জন্ম দিয়েছি আমিই
বিশ্রাম লেখা নেই তোমার পায়ের পেশীতে।
পথ বেঁধে দিয়েছি আমিই
খুঁজে নিও, খুঁজে পাবে– পথেই তোমার মুক্তি
কানে কানে বলে গেল বিধাতা।

শিকড়ের আমন্ত্রণ

নদি আর শিকড়ের জীবন কাহিনি উত্থানে আর পতনে
স্রোতস্বিনী বুকে পাথর গড়িয়ে এগিয়ে চলে
যেমন মাটি সরিয়ে শিকড় এগোতে থাকে
রসের সন্ধানে, নদিতলেরও গভীরে
যতদূর চোখ যায় শিকড় এগোয়।
প্রতিদিন সন্ধ্যার দীপজ্বালা অনুষ্ঠানে
লোহার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে মানুষ
মাপজোক চলে শিকড়ের।
শিকড়ও পথের বাঁকে দেখতে পায় সঙ্কট ও সম্ভাবনা।

জীবনের পাঠ লেখা হয় জন্মের পূর্বে
মায়ের গর্ভে কানে কানে বলা হয়—
তোমার একটিই জন্ম, সদ্ব্যবহার করো।
যে ভ্রুণ যাত্রা শুরু করেছিল রক্তস্নান করে
মাতৃগর্ভ থেকে প্রতিজ্ঞা পাত্র হাতে নিয়েছিল
—কথা রাখতে পারেনি সে।
সূর্যের আলোতে এসে পথ হারাল।
আকণ্ঠ ভোগ আর তাড়না
রক্ত ঝরায় নিজের, রক্ত ঝরে মানুষের।

একদিন সে দুর্বল হাত দুটি শূন্যে তোলে
ভিখিরির পোশাকে হাত বাড়িয়ে দেয় আকাশে
সকলেই হাত বাড়ায় একদিন এভাবেই।

ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে সমস্ত ছাদ
সকলের শরীরে
সব মানুষের তখন একটাই চেহারা
ধুলো আর বালির আস্তরণে।
শিকড় সকলকে কাছে ডেকে নেয়
কারণ শিকড়ের একটা অমোঘ আমন্ত্রণ থাকে।

জনারণ্যে পদাতিক

মণ্ডপের রাস্তা বেয়ে জনারণ্যে
পায়ে পায়ে হাঁটছে শিশু কিশোর
যুবা বৃদ্ধ ধনী গরিব– হাঁটছি আমিও
জন্ম থেকেই হাঁটছি।
আলো আর আলো
দীপাবলির আলোক সজ্জায়
আমি ভুলে গেলাম আমি কে।

গাড়ি আটকে দিয়েছে ভলান্টিয়ার
মানুষের স্রোতে হাঁটছি
একটি মাটির দেবী দর্শন করব বলে
মানুষ আর মানুষ চলেছে
কারও বুকে কোনও পরিচয় লেখা নেই
জন সমুদ্রে সাঁতরে চলেছি
বিপুল জলরাশির এক অপার শান্ত ঢেউয়ে
কারও কিছুই নেই মানুষ নামের বাইরে
সমান উচ্চতায় সব মানুষ
আমার মাঝেও আমি শব্দটি উধাও নিমেষে
রং বাহারি পরিচয়ের বাহাদুরি নেই।

অবোধ এক শিশুছাত্র আমি
বই কাঁধে চলেছি
জনসমুদ্রের চলমান পাঠশালায়
অহমিকা বয়ে চলা মেকি সম্রাট আমি এক ক্ষুদ্র কণা

কিছুক্ষণ আগেও নির্বোধ এক অহংকারি আমি
বোধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চিমটি কেটেছি নিজের গায়ে
জনারণ্যে নগণ্য পদাতিক আমি
গন্তব্য সকলের এক
সময়ের ব্যবধান মাত্র।

মুক্ত লোকালয়

একটা চাদরের নিচে লোকালয়
ভিতরে উত্তাপ আর ভালোবাসার ওম
জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর, তো কি হল?
ঘাম তো নেই।
ওরা চাদরের নিচেই স্বাচ্ছন্দ্য
জ্বরে জলপটি আর ভালোবাসায় এক ঠোঙা জিলিপি
এতেই ওরা সন্তুষ্ট।
পুরুষেরা কাজে বেরালেই মুক্তির হাওয়া
পুরো লোকালয় মেয়েদের দখলে।

নামাবলি চেপে আসে দয়াল ঠাকুর
হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে কীর্তন গান
উর্বশী বউ মা কাকিরা—
এঁটো হাতেই বেরিয়ে পড়ে
এখনও মেয়েদের কীর্তনে টানে
যত ঝুনঝুনিওয়ালা চুড়িওয়ালা
জানে দুপুরেই মওকা।
সরলমতি বউগুলো ঘরের বাইরে আসবেই
বাসনওয়ালার বাঁশীতে
খুটের পয়সা আর খলখল হাসিতে
দুটোতেই দরাজ এবেলা
পুরো লোকালয় স্বাধীন সার্বভৌম এখন।

শত নাম

বাবার স্বস্তির ঠিকানা খুঁজেছিল বৃদ্ধাশ্রমে
প্রতিমাসে কিছু টাকা
বিনিময়ে শান্তির আশ্বাস।
—ভালো থেকো বাবা।
—আমি আসব, প্রতি মাসে আসব।

—সেই থেকে শুরু—
একটি সংবাদের অপেক্ষা
ঘনঘন ঘড়িতে চোখ রাখা—
বাবাকে ভালো দেখে আসিনি
বাবাকে ভালো রেখে আসিনি।

এবং সত্যিই একদিন
সন্ধ্যায় সংবাদ বেজে ওঠে মোবাইলে—
আসুন, আপনার বাবা আর নেই।

শেষ সূর্যাস্তের শেষ প্রহরে
বন্ধ চোখের উপর শোয়ানো তুলসী পাতা।
আগুন ধোঁয়া আর কান্না জ্বলে ওঠে চন্দন কাঠে।
চিতার কুণ্ডলী বেয়ে উপরে ওঠে অন্ধ সূর্যগ্রহণ
আকাশের সীমানা বয়ে চলে সতীর অশ্রুধারা
স্বর্গের পথে অচেনা যাত্রায় আকুল ক্লান্ত শবদেহ।
স্তোত্র পাঠে ভারি হয় বাতাস
কাঁপতে থাকে সকলের পায়ের নিচের মাটি

দিকচক্রবালে প্রতিধ্বনিত হয়—
—আমি আমার পূর্বপুরুষের কাছে গেলাম
—আর ফিরব না তোমাদের কোলাহলে।

অস্থি কলস সম্বল করে ঘরে ফেরে সন্তান
নামগানে চকিত প্রতিবেশী পথচারী
কানের পর্দায় পরিহাস—
—আপনার বাবা বড়ো ভালো মানুষ ছিলেন।
সেতারের তার ছিঁড়ে ঘরে ফেরে শব্দহীন আত্মীয় অনাত্মীয়।

কানের পর্দায় যন্ত্রণায় আছড়ে পড়ে অগণিত কণ্ঠ—
—আপনার বাবা বড়ো ভালো মানুষ ছিলেন।
শোকাহতের তালিকা দীর্ঘ হতে থাকে ভারি ভারি নামে।

এখন তুমি স্বর্গের সাথিদের সাথে
মশগুল হাসি ঠাট্টায়
ভুলেছ পৃথিবীর তুচ্ছ মায়া
করুণার ঊর্ধ্বে তোমার সিংহাসন
চোখ বুলিয়ে নিচ্ছ দীর্ঘ অপেক্ষার তালিকায়
কত শত নাম স্বর্গের দেয়ালে।

স্পর্ধা

তোমার অহল্যা সিঁথির সিঁদুরে
আমি নিজেকে পাই
প্রত্যহের গভীর আস্থায়।
তোমার সিঁদুরের প্রতিটি কণা
আমাকে সূর্যস্নান করায়।
প্রতিরাতে আমি সম্পূর্ণ একা একজন
অন্ধকার নিভৃতে আমি পদ্মাসনে মগ্ন হই
তোমার ভারি মেঘ তখন আমার বুকে তিলক চিহ্ন আঁকে।

তুমি বলেছিলে—
পাঁচ টাকার এক কৌটো সিঁদুর কিনে এনো
বিশ্বাসে সাত রাজার মাণিক্য পাওয়া যায়।
আমি ফণী মনসার বাগানে যাব
তোমাকে ঠিক খুঁজে নেব কাঁটাবনের মাঝখানে।

তুমি বলেছিলে—
পাঁচ সমুদ্র চোখের জল আছে আমার
পাশা খেলায় হারতে দেব না তোমাকে।
তোমার শত রুক্মিনীদের ভিড়ের মাঝেই
আমার সিঁথিতে সিঁদুরটুকু দিও।

আমার অসীম স্পর্ধা,
আমি জানি
সিঁদুরের শক্তিতে তুমি আবার শান্ত হবে
শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় ছেড়ে

তুমি আবার আসবে কলেজ স্ট্রিটে
গোষ্ঠ পালের বইয়ের দোকানে।
তোমার মুখ থেকে মুখোশ খুলে
ছুড়ে ফেলবে নাইট ক্লাবের ডাস্টবিনে
আবার দু'জনে ঝিনুক কুড়োবো সাগর পাড়ে
আবার দু'জনে হারিয়ে যাব গহীন ঝাউবনে।

কবিতা ও কনফারেন্স

রাতে কবিতা লিখেছিলাম
জোনাকির আলোয়—

দুটো বেতের চেয়ারে
মুখোমুখি দু'জনে বসে
নন্দিনী আর আমি
মাঝখানে একটি সেন্টার টেবিল
সেটিও পাহাড়ি বেতের।
শিলিগুড়ির চা বাগানে
নিরালায় নিরিবিলি কটেজে
শীত শীত পাইন গাছে ঘেরা
তুমি টেবিলের ওপাশ থেকে ঝুঁকে বললে,
—চা না কফি?
তোমার ঝুঁকে পড়া ছায়াপথে দৃষ্টি গেল আটকে
বললাম, আজ তোমার চয়েস।
তুমি দুষ্টু হাসিতে বললে, ওকে, কফি।
সকালে তোমার গরম কফিই পছন্দ—
আমিই শুধু জানি, শুধু আমিই।

নন্দিনীর মোবাইল বেজে উঠল,
উঠেছ, ঘুম ভেঙেছে?
শিলিগুড়ির কনফারেন্স হলের গেস্টরুমে লেপ মুড়ি দিয়ে
বন্ধু উজ্জ্বল তখনও ঘুমিয়ে।
আবার উঠে প্যান্ট সার্ট টাই স্যুটে ছুটতে হবে

কোনমতে ব্রেকফাস্ট
সারাদিন কনফারেন্স
দুপুরে ওয়ার্কিং লাঞ্চ।
রাতের ফ্লাইটে মাঝরাতে ঘরে ফেরা।

নন্দিনীকে বললাম,
কবিতা আর কনফারেন্সের সহ অবস্থান, সম্ভব ?
নন্দিনী বলেছিল, সবই সম্ভব।
চোখ আর মনের মিলনেই
পূর্ণিমার চাঁদে প্রিয়ার মুখ।
সারাদিনের কাজ শেষে সূর্যেরও সাগর সঙ্গম হয়।
পৃথিবীতে পুরুষের চোখ শুধুই মুক্তো খোঁজে
ঝিনুকে শুধু মুক্তো থাকেনা গো,
মুক্তোর গায়ে ভালোবাসাও লেগে থাকে।

কালো খাম

একটি কালো খাম–
সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি ব্যাক পকেটে।
রাখতেও পারছি না, ফেলতেও পারছি না
ঝোপে ঝাড়ে, না কোনও ডাস্টবিনে।

কি আছে তোমার কালো খামে? এত লুকোচুরি?
আছে অনেক কথা, অনেকের কথা
আছে অনেক ব্যথা, অনেকের ব্যথা
ওদের যন্ত্রণার না বলা কথা
আমি মৃতদেহের ঘুম ভাঙাতে পারিনি।

কেউ যদি দেখে ফেলে, নির্ঘাত একটি কবিতা লিখবে
সেই ভয়ে মরি।
কেউ যদি সব পড়ে ফেলে?
মুখস্ত করে পাহাড় হবে বক্তৃতার।
কেউ যদি খাম খুলে ব্যথা চুরি করে?
তোমরাই দোষ দেবে আমাকে।

স্ট্যাম্প লাগালাম, ঠিকানাও লিখলাম–
তোমাদের খোঁয়াড়ের ঠিকানায়।
পোস্টমাস্টার ফিরিয়ে দিল, ধুর মশাই
কালো খামে কেউ ঠিকানা লেখে?
হলদে খামে লিখুন, হলদে খাম–
সেন্ট মাখানো রঙিন খামে লিখুন?
এর একটা স্ট্যাটাস আছে।

পোস্টমাস্টারও জানে হলুদ খাম-রঙিন খাম শুধুই সুখী মানুষের।
দুঃখী মানুষদের নিয়ে যত দুঃখ আর বিলাসিতা
কাব্যে আর কবিতায়
ধৈর্যে আর অধর্মে।
কালো খাম সেই ব্যাক পকেটেই রয়ে গেল।

মোহমুক্তির সাগরবেলায়

হলঘর ছেড়ে লোকালয়ে এলাম
বেরিয়েই দেখি একটা মুক্ত সাগরবেলা
লৌহকপাটের বাইরে তাকালাম।
কি আশ্চর্য– সব শৃঙ্খল গলে গলে পড়ছে।
দমবন্ধ মঞ্চের বাইরে ঝুরঝুরে বালিতে পা রাখলাম
শ্বেত কপোতেরা আমার কপালে ফুল চন্দন এঁকে দেয়।
মুক্ত বিহঙ্গরা আকাশময় নৃত্যগীতিতে মাতল
সমুদ্র ফেনায় জন্ম নেওয়া বাতাস আমাকে আলিঙ্গন করল।
শ্বাস নিলাম বুক ভরে
ফুসফুসের আয়তন বেড়েই চলে
বেড়েই চলে।

এখন সূর্যোদয় হয় আমার ইচ্ছেমতো
কতদিন আমি রোদ্দুর ছুঁয়ে দেখি না
লাল কাঁকড়াগুলো রোদ্দুর মেখে খেলছে
কাঁকড়া আর রোদ্দুরের কোন লোভ নেই।
বৃষ্টিতে ভিজলেই সব পাখি মুক্ত স্বাধীন হয় না
মুক্ত রোদ্দুর চাই।
দূরে মেষপালক নীল আকাশ দেখছে
ওর চারণভূমির কিছুটা ধার নেব
মেষ গুনতে গুনতে মেষপালকের সাথে হাঁটব
আমার নগ্ন পায়ে কাঁটা ফুটবে
রক্ত ঝরবে
ভিজে উঠবে মাটি
যন্ত্রণা মুছে দেবে চারণভূমির স্বাধীন কচি ঘাসেরা।

অন্ধকার দর্শন

কি ভেবে একদিন সংসার সীমান্তে দাঁড়ালাম
চোখ দুটো বন্ধ রাখলাম কিছুক্ষণ
হঠাৎ দেখা এক সুন্দর অন্ধকারের।
অন্ধকারে খুলতে লাগল আলোর এক বিশাল সম্ভাবনা।
সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার সমুখে উপস্থিত ভিক্ষাপাত্র নিয়ে।
গ্রহ নক্ষত্রের মাঝ দিয়ে দ্রুত রথে
ছুটছি আর ছুটছি।
অনেকক্ষণ আলোর ছায়াপথে
সকলের সাথে।

সব শুনতে পেয়েছিলাম—
নারী-পুরুষের কথোপকথন
প্রসাধনহীন কুমারীর ভায়োলিন
নামাবলি জড়ানো কীর্তন গান।
যারা চলে গেছে খালি হাতে
নগ্ন পায়ে
নগ্ন গায়ে
সব ঠিকানা মুছে দিয়ে, তারা আজ
মাছের চোখের মতো ভাষাহীন।

কখনও চোখের আড়ালে যেতে হলে
খোলা চোখ এভাবে বন্ধ রাখতে হয়।
চোখের আড়ালেই লক্ষ দৃষ্টির দেখা মেলে
অন্ধকার সুগ্রীবের মতোই আলোর উৎসে
ঠিক পৌঁছে দেয় নিপুণ নিশানায়।

শব্দহীন প্রতিক্রিয়ার মহাসমুদ্রে সাঁতার কাটা।
বিশাল টিউলিপ বাগানে স্বেচ্ছায় হারিয়ে যাওয়ার মতন মজা।
মজা করতে করতে
শেষবারের মতো চোখ বোজার আগে
একটিবার চোখ খোলা রাখার এ খেলা।
স্বর্গ নরকের মাঝখানে বিচারাধীনদের ময়দান
হাতজোড় করে দাঁড়ানো মৃত মানুষের লম্বা লাইন
এসব দেখতে হলে
চোখ বন্ধ করতেই হবে একবার কিছুক্ষণ
মাঝ সমুদ্রে চাবি ছুঁড়ে ফেলে
স্বার্থ আর সম্পর্ককে লকারে তুলে রেখে।

ওদের কথা

দীপু বলল, দুঃখ নিয়ে কবিতা লেখা ছাড়বে কবে?
হাসি থাকবে, আনন্দ থাকবে
পদ্মাবতীর নাচ থাকবে
এসব নিয়ে কবিতা হয় না?
এ বাজারে ছাড়ো না দু' একখানা।

ছৌ নাচবে কৃষ্ণকলি
কোমর ভেঙে জল ঢালবে
শিবের মাথায়।
মাদল বাজবে, শিঙা ফুঁকবে
শাঁখা ভেঙে সিঁদুর মুছবে
ঘুরে দাঁড়াবে ওপাড়ার বউ সবিতা
তবেই না এই সময়ের কবিতা।
বিষাদ তোমার চাই ই চাই?
আঁচড় লাগবে বুদ্ধিজীবী তকমা খানায়
এটাই ভয়?

ভাল্লাগেনা ইনিয়ে বিনিয়ে ঝিমুনি ধরা কথা বলা
তোমার ওই আঙুর আপেল কবিতা।
হার্ড কিছু দাও, দাঁত ভাঙবে– কোমর ভাঙবে।
দেখ না লিখে একখানা।
পড়বে পড়বে, পাঠক আছে জবরদস্ত।

কিসের ভয়, কিসের এত লজ্জা শরম?
আমরা আছি, অনেক আছি

তোমার চোখে চশমা আঁটা, চিনতে তুমি পারছ না।
ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কবিতা লেখা ছাড়বে যেদিন
বদলটা আসবে সেদিন।
শিরদাঁড়াটা সোজা করে শক্ত হাতে কলম ধর
তাকাও দেখি সোজাসুজি,
ওদের চোখে চোখ রেখে।

সূর্য ও সুতপা উপাখ্যান

তুমি সূর্যের সাথি হয়েছ কখনও ?
তুমি কি জানো সুতপা,
সকলে সূর্যের প্রেমিকা হতে পারেনা।
হীরে আর আগুন কখনও মিথ্যে বলেনা
সূর্যই ফুলের কুঁড়িতে রূপ আর সুগন্ধ আনে
যখন পৃথিবী ঝলমল করে ওঠে প্রখর তাপে
তখন সূর্যমুখী বলে—
আমি এসেছি সূর্যদেব,
দু'হাত প্রসারিত কর।
আমাকে গ্রহণ কর তোমার আলিঙ্গনে।

সুতপা প্রজাপতির কানে বলে—
আমাকে নিয়ে যাবে তুমি সূর্যের বিছানায় ?
আগুন আমার অন্তর।
সূর্য তপস্যা আমার প্রার্থনা।
সূর্যের তাপে সূর্যমুখী যেমন পূর্ণ যৌবনা হয়
আমিও হতে চাই সূর্য আদরিনী সম্পূর্ণা।

আমি হিমালয় পত্নী মেনকা।
হিমালয়ই আমাকে রোজ সমর্পণ করবে সূর্য প্রণামে
সপত্নীকে নিবেদন করবে সূর্য আরাধনায়।
আমি একমাত্র সূর্যের প্রেমিকা হব।
হিমালয় সূর্যের পরকীয়ায় দুঃখ করে না।
হীরের আংটি চুম্বন করে চোখ ছলছল সুতপা ডুকরে কাঁদে

হীরের আংটি যেমন আমার আঙুল আঁকড়ে আছে
সূর্যদেব থাকবে আমার হৃদয় জুড়ে।
শরীর থাকবে হিমালয় ক্রোড়ে
বিরহ দহনে আমি জ্বলব
হিমালয়ের তপোবনে।

সুতপার নিবেদন পৌঁছে গেল সূর্যের কাছে।
সূর্যের আহ্বান শোনে সুতপা—
সুতপা,
হিমালয় পত্নী তুমি।
আমি রব দূরাকাশে
'তোমা হতে বহুদূরে'
হিমালয় তোমার সিঁদুর ঠিকানা
তোমার নাটমন্দির রেখো হিমালয় শীর্ষে।
তোমার আকাশে ছায়া দেব আশ্রয় দেব
আমি উত্তাপ দেব, ভালোবাসা দেব
অনন্তকাল।

চোখের জলের ছবি

(কাশ্মীরের পুলওয়ামার আতঙ্কবাদী বিস্ফোরণের পর)

সেরা কবিতাটি লিখব বলেছিলাম
তুমি বললে, কবিতা কোথায়?
এ তো বিরহের গান।

সেরা ছোটো গল্প লিখব বললাম
তুমি কেঁদেই একাকার
এ একটা গল্প হল?
এ তো সোফিয়া লোরেনের সানফ্লাওয়ার।
কাঁদতে কাঁদতে হল ছেড়েছি কতবার।

তবে একটা সেরা ছবি আঁকি?
তুমি বললে,
কেউ আমাকে এক আকাশ সুখ এনে দিলেও
কাউকে দেব না এ ছবি।
কেউ আমাকে এক নরক দুঃখ দিলেও
ফ্রেমে বাঁধিয়ে বুকে রাখব এ ছবি।
ছবিতে পুলওয়ামায় বীরের হেলমেট
চোখের জলেও রঙ উঠবে না কোনদিন
কাঁদবই না হয় সারাজীবন।

গল্পের বৃত্ত

বসন্ত এল না গেল
আমার কি বা এসে যায়
যদি দক্ষিণ দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রহরী।
যদি তুমি প্রশ্ন কর অকারণ—
মন্দিরে পুরোহিত— সে নারী না পুরুষ
ঘরের দেয়ালে-অর্কিড না মৈথুন চিত্র?
আমার কি বা এসে যায়।

কিশোরীর চিবুকে স্পর্শ লেগে আছে।
যদি কেউ প্রশ্ন করে—
কি ছিল সে স্পর্শে?
—বিষ না ভালোবাসা? কামনা না কান্না?
তরুণ গৃহশিক্ষক সন্দেহের বেড়াজাল ছিন্ন করতে পারেনি।
কবিতা লেখা ছেড়েই দেয় সে।
অন্ধকারের কালো বেড়ালটির মতো হারিয়ে গেল চিরতরে।
যেমন রঙিন প্রজাপতির পাখাগুলো খসে পড়ে পৃথিবীর পথে
তেমনি দুগ্ধস্রোত শুষ্ক মাটিতে পড়ে দিক শূন্য হল।

প্রমাণ মেলেনি ইভ নিষিদ্ধ আপেল খেয়েছিল কিনা
আদম মহাপুরুষ হয়ে গেল রাতারাতি।
রটিয়ে দেওয়া হল নারী ফল খেতে ভালোবাসে।
সেই থেকে নারীকে অকর্মণ্য রেখে শুরু হল তার আরাধনা।

বিমানবালা সতর্ক করে ঘনঘন—
বলা হয় মর্ত্যে অবতরণের আগে সিট বেল্ট বেঁধে রাখতে

তেমনই বলা হয় ইষ্টনাম ঠোঁটে রাখতে
চিতার আগুন যতক্ষণ জ্বলছে।
নিষেধ আর নির্বাসনে কত বাউল পথেই হয়েছে নিরাকার
ছিঃ ছিঃ ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না— শাপ শাপান্ত দিঘির কুলে দাঁড়িয়ে
প্রেম না পেয়ে কত পদ্ম জলের নিচে ডুবে মরল।
প্রেমে আর মরণে কাঁঠালিচাঁপার গন্ধ পাওয়া যায়।
আর
এভাবেই হয়ত পূর্ণ হয়েছে অনেক গল্পের বৃত্ত।

দূর্বাঘাসের কার্পেটে

বসন্ত আসছে
ফ্লাই ওভারের ধারে পলাশ ফুলে
কলেজ হোস্টেলের কৃষ্ণচূড়ার ডালে
ক্যান্টিনের আড্ডায়
তোমার খোঁপার তরঙ্গে
আমার নিঃসঙ্গ স্মৃতিতে
আগুন মেখে আসছে
লাল ফুলে।
কল্যাণী,
মনে পড়ে?
তখন একটা আইসক্রিম খেয়েছি দুজনে
সে আইসক্রিমে অন্য স্বাদ।
দু'জনের দু'হাতে দু'মুঠো ভালোবাসায়
সে স্বাদ লেগে আছে আজও- মনে আর ঠোঁটে।
ফাগুনের অপেক্ষা
ভুলিনি চৌকাঠ পেরোনো শেষ মাঘ।
শীত কমে গেছে,
ছোঁয়া লেগে আছে শরীরের রোমকূপে
সোয়েটার হ্যাঙ্গারে ঝুলছে
ফুলশার্টেই চলছে বেশ।
কলার তুলে শার্টের বোতাম খুলে
শিস দেওয়া সেই বিকেলে
সম্রাট নেপোলিয়ান আমি।

হিমেল বাতাসে পাশাপাশি
শেষ মাঘের সন্ধ্যায়
ঘন দূর্বাঘাসের কার্পেটে
কলেজ লনে দুই অন্তহীন কথোপকথন—
ভুলিনি।

পেছন থেকে বলে ওঠে নন্দিনী—
মাফলারটা জড়িয়ে নাও
ঠাণ্ডা লাগবে।

রাত মৃগয়া

আমি বনাঞ্চলে গিয়েছি শিকড় সন্ধানে
তীরধনুক হাতে নগ্ন শিশুকে বড়ো হতে দেখেছি
সেখানে শ্বাপদ ও সন্ন্যাসী অস্ত্র শিক্ষা নেয় গাছের আড়ালে।
যখন রাজধানীর নাচঘরে নর্তকীর কান্না থামেনা
তখন রাতে জোনাকিরা আলো জ্বেলে রাখে
ঝিঁ ঝিঁ পোকারা তখনও কাঁদে
যখন ঘুঙুরের আঘাতে রাঙা পা রক্তে ভেসে যায়।
সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখা যায়না।
সেখানে একবার গেলে কেউ ফিরে আসেনা।

আমি রাজমহলে গিয়েছি নাচঘরের মেয়েদের দেখতে
লুকিয়ে মধ্যরাতে শুনেছি নাচতে নাচতে কান্না
দেখেছি হাসতে হাসতে বিষের পানপাত্র মুখে নিতে
আলো নেভে আর বাতাস হয়ে ওঠে ভয়ংকর শান্ত নীল।
রাত তখন রাক্ষসীর পোশাকে—
বুভুক্ষু রাজন্য আর প্রহরীদের চোখে জ্বলজ্বল ক্ষুধা দেখেছি।
কন্যাদের রাজমাতাও রক্ষা করতে পারনেনি।
রাজমাতা জানেন—
কখন মানুষ আর পশু একত্রে মৃগয়াতে যায়।

চৈতন্যে ফিরে যায়।

অদ্ভুত সঙ্গী ওরা
        কেউ চেনা, কেউ বা অচেনাও
স্বাদ বদলের রেস্টুরেন্টে
কুৎসিত কুণ্ডলির স্ট্যাটাসে নিত্য নতুন মেনুকার্ড।

দরজায় এসে টোকা দেয় চৈতন্য
ভিতরে শেয়াল আর হায়েনার শব্দ শোনে
দুই কান চেপে চিৎকার করে–
মৌসুমি, তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি
আমার ফুলবনে ফিরে চল।
নরক গুলজার ছেড়ে বেরিয়ে এসো
এখানে ঝলসানো ঝিনুকে মুক্তোরা মৃত।

শুক্লাদ্বাদশীর চাঁদ এনে দেব তোমার হাতে।
লং ড্রাইভে
গাড়ি থামিয়ে তোমার পিঠে কাশফুল বোলাব।
হাঁটু গেঁড়ে বসে তোমার হাতে গোলাপ তুলে দেব।
তোমার স্নানের পর মেঝেতে ঠাণ্ডা তোয়ালে পেতে দেব–
মৌসুমি কিছু শুনতে পায়না
বদ্ধ ঘরের দেয়ালে দাউ দাউ আগুন জ্বলতে থাকে।

নষ্ট কৈলাসে মত্ত মৌসুমি।
ক্যানভাসে ধ্রুপদী ছবি এঁকেছিল চৈতন্য।
দীর্ঘশ্বাসে মুছে গেল তুলির সব আঁচড়, সব রঙ।
এক ব্যাগ স্বপ্ন এনেছিল
স্বপ্নরা দুঃখী পায়রাদের সাথে উড়ে গেল
চৈতন্য ফিরে গেল মাঝি মাল্লারের ছাউনিতে।

বিশ্বাসী রাত

কালো পাহাড়ের চুড়ায় বসে ওরা দুঃস্বপ্নে
ক্যালকুলেটরে চোখ রাখে
দিনরাত দুশ্চিন্তার ভাঙা সিঁড়িতে বসে—
স্বর্গের শীতাতপ কুঠুরিতে আয়াস আর অপ্সরী?
না, পরজন্মে পুনরায় বরাদ্দ শেয়াল কুকুর জীবন!
শেষ পাতায় কি লিখছেন ঈশ্বর?

মাছ আর মেয়েছেলে একই কথা
ছিপ ফেলেই ধরতে হয় ওদের।
পীর ঠাকুরের তাবিজ কবচে
পাঁচ আঙুলে পাঁচটি পাথরে আটকে দিয়েছি
পুলিশ কিংবা প্রলয়, পিশাচ কিংবা অভিশাপ।
দুই ঠোঁটে চেন স্মোকারের মতো অবিরাম বিবেকানন্দের কোটেশন।

সামনে দাঁড়ানো ইহকাল হাসে
সিঁদুরে সতী সন্ধানে এত চর্চা কেন সন্তান?
একবার উপরে চেয়ে দেখ
এখনো আকাশ নীল
এখনো সূর্য তারা চাঁদ তোমার পরিচর্যায় অনুগত
শীতের বিছানা ছেড়ে দেখ একবার
রাস্তা পার হয় শ্রমজীবী
শেষ ট্রেন ধরে তখন রাত বারো
পথ প্রশ্ন করে না—
কে হাঁটছে তার বুকের উপর?
সে পুরুষ না নারী, সতী না অসতী?
পথ বোঝে ওদের গায়ে শুধুই শ্রমের গন্ধ
বিশ্বাসী রাত জেগে থাকে ওদের পাহারায়।

মানুষে ঈশ্বরে কথা

তুমি ঈশ্বর
তোমাকে বদলে দিয়েছি আমরাই—
'আমি আমি' তে
বদলে নিয়েছি
সাজানো কুয়াশার জালের মতো।
যেখানে যত ঈশ্বর সকলকেই
স্থান দিয়েছি জাদুকরের অলৌকিক আস্তিনে।
কোথায় তোমার অস্তিত্ব
যদি আমিই না থাকি আমাতে?
যদি আমিই না থাকি তোমাতে?
আশীর্বাদ বিলিয়ে পরিশ্রান্ত তুমি
ভোগের থালা সাজাতে সময় বয়ে যায়
গঙ্গা যমুনার স্রোতে ফুরিয়ে যায় ভক্তের সন্ধ্যারতি
সেখানে ব্যস্ত দেবতারা শিবের তোষামোদে।
দানবাক্সের পরিচর্যায়
সুনিপুণ দেবদাস
ঈশ্বর সেবায়—অপটু সেবাদাসী
একান্ত আরাধনা স্বপ্নই রয়ে গেল।

একদিন কথা হবে দু'দণ্ড দু'জনার?
জমা আছে অনেক সে কথা
একদিকে আমি অন্যদিকে তুমি
—মানুষে ঈশ্বরে কথা?

রাধা

আমি চোরকাঁটার বনে পৌরাণিক ধ্বনি শুনেছি।
বিশ্বাসে খুলে দিয়েছি তীর্থের রঙিন আবাসভূমি।
প্রতিদিন সকালে চোখ খুললেই দেখি—
কত শাখাস্রোত মেশে যমুনার স্রোতে
কত শিরা উপশিরা মেশে হৃদয় রক্তে
কত উপমিছিল মিলেছে জনসমুদ্রের মহামিছিলে
যমুনার স্নান শেষ হয় সমুদ্রকূলের উপবনে
মেঘেরা শঙ্খধ্বনি করে তখন।
সমুদ্রের কানে ভেসে আসে-যমুনা তারই।

যতই কৃষ্ণের মুখ ঢাকা পড়ুক আবিরে
যতই রাধা বিনা উৎসব হোক বৃন্দাবনে
কৃষ্ণের বাঁশি খোঁজে— রাধা তুমি কোথা?
বৃন্দাবন খুঁজে ফেরে কোথা পাগলিনী রাধা?
কলঙ্কমাখা চাঁদের আলিঙ্গনে ভোর হয় আকাশের।
আকাশ চাঁদকে বলেছিল—
চাঁদ তুমি শুধুই আমার
বাসন্তী শাড়ি পরে এমন দিনে রাধা বলেছিল—
কৃষ্ণ, তুমি শুধুই আমার।
দু'হাতে বিপুল জলরাশি নিয়ে সমুদ্র বলেছিল—
যমুনা, তুমি শুধুই আমার।

গোপিনীরা কৃষ্ণের বুকে মাথা রাখে
বৃন্দাবনের ঝুলনে
কুঞ্জবনের দোলনায়।
এরই মাঝে একটি নামই বাজে কৃষ্ণের বাঁশিতে
—রাধা রাধা
—রাধা রাধা।

আকাঙ্ক্ষা

দেখতে চেয়েছিলাম
নদির উপর আলো আর আকাঙ্খার ব্যাকুল ঢেউ।
দেখেছি
পাড় ভাঙা নদি আর নিঃস্ব মানুষ কি অসম্ভব চুপ
দেখেছি
লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ কেউ মুছে দিল ভর সন্ধ্যায়।
খুঁজেছিলাম
জমিতে হারানো শিশুর জন্ম দিনের কার্ড
দেখতে পেলাম
লাঙলের ফলায় উঠে আসল
মুঠো মুঠো সোনা আর মাটি।
সেদিন
ধুলো জমা পুরনো বাক্স খুলেছিলাম
তোমার নীল খামে হলুদ চিঠিগুলো পেলাম।
সব চিঠিতে লেখা আছে একটিই কথা—
রাজবাড়ির সিংহদুয়ারে আমি ছড়িয়ে রেখেছি
আঁধার মুক্তির মন্ত্র।
একদিন দেখবে
রাজবাড়িতে এক শয্যায় ঘুমোবে রাজা আর সন্ন্যাসী।

আমি রাতে মাথা তুলে তাকালাম
আকাশের দিকে
চিঠি হাতে একটা কিশোরী উড়ে গেল ওপারে।

যখনই চিবুক নামিয়েছি পথে
কত অক্ষর হারিয়ে ফেললাম ধুলোর আস্তরণে।
কেউ পড়তে পারল না।

সব খুইয়ে প্রার্থনায় বসেছি আবার
চোখ দুটো মেলেছি আশায়।
বিশ্বাসে পেতেছি বুক–
কবে ফিরে পাব সেই উপবন
যেখানে আসা যাওয়া নেই–
কোনও শকুন শেয়ালের তস্করের
খোলা মাঠের সন্ধ্যায়
যেখানে তাজা ঘাসের ডগায় শিশির জমে
ভয়হীন ভরসায়।

একটি ছোট গল্প লেখা যেত

আবার একটি লাল পলাশের জন্ম হতে পারত
আবার একটি ছোট গল্প লেখা যেত
যদি তুমি ক্ষণকাল ফিরে দেখতে—
তোমার ছেড়ে আসা বসন্তেরা কেমন আছে।

আবার একটি কৃষ্ণচুড়ার জন্ম দিতে পারতে
যদি তুমি সোনালি ডানার কোন মেঘবালিকা হতে।
আটপৌরে হলদে শাড়ি পরেছ কখনও ?
প্রসাধনী মেখে পাহাড়ের ঢালে বসেছ ?
মাঝরাতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছ কখনও ?
তোমার কপাল জোড়া সিঁদুরে তখন আগুন
তাকিয়েও দেখনি সাহস করে
তোমার চুড়ি ভাঙার শব্দে
ঘরের কাঁচ ভাঙার শব্দে
আয়না ফেটে চৌচির হত
বসন্তের রাতও জেগে উঠত।

কারো ঘুম আসেনা
মালিনী জানে তার বাগানে আজ ফুলচোর এসেছে
তবু বিছানা ছাড়েনা সে।

সুন্দরের স্বরলিপি

যখন বললাম
আজ সুন্দর লাগছে আপনাকে
তখন আপনি এক হঠাৎ ষোড়শী
এক পশলা বৃষ্টি আপনার চিবুক বেয়ে
পশ্চিম আকাশটা লাল হতে লাগল।

যখন বললাম
ভালো হয়ে গেছেন আপনি
কাল আপনার ছুটি।
তখন কষ্টরা একে একে ওয়ার্ড ছাড়ল
আপনার ওষ্ঠ দুটি দুলে উঠল।
এক লহমায় শিউলি গাছ ফুলে ভরে উঠল।
আপনি ঈশ্বরের সাথে কথা বললেন কিছুক্ষণ
করজোড়ে।

আমি হাসপাতালের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম
ঘরের পথে পা বাড়ালাম
বাইরে হেমন্তের সন্ধ্যা নেমেছে
শ্যামা পোকারা নাচছে স্ট্রিট লাইট ঘিরে
খালি পায়ে শিশির ঘাসে হেঁটে চললাম
তখন আমার বয়স কমে আঠারো।

পাঁচিল

আকাশ থেকে একটা পাঁচিল নেমে এসেছে
আমাদের মাঝখানে ভীষ্মের মত নীরব
যখনই হাত বাড়িয়েছি তোমার দীপশিখার দিকে
তুমি ডানা গুটিয়েছ সলজ্জ ময়ূরীর মত,
দরজা বন্ধের শব্দে টুকরো টুকরো হয়েছে চতুর্দশীর চাঁদ
পাঁচিলখানা কেঁপেছে অজানা শঙ্কায়
রব উঠল—গেল গেল, রসাতলে গেল সমাজ।

যখন তোমার চোখে চোখ রেখেছি
দেবদারু ইচ্ছেগুলো বৃষ্টিতে ভিজেছে
জলপ্রপাত উঠেছে নদিটির তলদেশ ফুঁড়ে
ঝরনার ধারায় তখন রঙিন প্রজাপতি সংবাদ
তোমার চোখের তারায় দেখেছি উপোসি রোদ্দুর
শুনেছি তোমার শাড়ির পাড়ে শরতের মেঘ ওড়ার শব্দ।
আমি ভুল বুঝেছিলাম সাগর পাড়ের বাতিস্তম্ভকে
স্বর্গের পুষ্পবৃষ্টি আমি দেখতে পাইনি
আমি দেখতে পাইনি—
তোমার অশ্রুসিক্ত চোখ
পাঁচিলে হেলান দিয়ে তুমি দাঁড়িয়ে আছ।
এসো ভেঙে ফেলি রুক্ষ পাঁচিলটা।

প্রিয় গিটার

প্রিয় গিটারে জড়ানো
পুরোনো শুকনো মালাটি
বকুলে গেঁথেছিল অনেকদিন
কিছু ফুল ছেড়ে গেছে মালাটিরে
তবু মালাটিরে সে ছাড়েনি আজও।

এসেছিল সে এদিনও
গেয়েছিল কি গান যেন
ওর তৃষ্ণার্ত চোখের দীর্ঘশ্বাস মঞ্চের বাতাসে
বলেনি কিছু– গানেই ভরাল মন
চাতকের তৃষ্ণা নিয়ে গান গেয়ে যায়–

যে ফাল্গুনে তুমি চলে গেলে
নীল গাংচিলের হাত ধরে
শেষ রাতের শেষ ট্রেনে
তোমার দ্বারে বারে বারে কৃষ্ণচূড়া হয়ে
সে ফাল্গুনে আমি আসব
বসন্তের গন্ধ মাখা কোকিল হয়ে
মাটির উপর ঝরে পড়া পলাশ হয়ে
আমি আসবই।

উল্কার মত আসব
তোমার হৃদয় কুলে নিঃস্ব হতে
গান গেয়ে ফিরে যাব অজানা সপ্তপদীর দেশে।

কবিতা স্বপ্ন

তোমার আঁচল লুকিয়েছ গুমোট আকাশে
তুমি জানোনা
গুমরে গুমরে স্বপ্ন সুখের পায়রাগুলো
উড়তে ভুলে যাচ্ছে প্রতিদিন
একদিন পঙ্গু হবে ওরা
দেখে নিও।

অসহায় কবিতারা এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে
ল্যাপটপ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে
ধুলো বুকে কি-বোর্ড শুধু চেয়ে থাকে
আমার সৃষ্টিছাড়া শূন্য চোখের দিকে।
কবিতার সে মায়াজাল কোথায় গেল
ভেবেছ কি একটিবারও ?

শব্দরা আমার কলম আঁকড়ে পড়ে আছে
যন্ত্রণা বুকে মুক্তির পথ খোঁজে কবিতায়।
নিদ্রাহীনের ক্রীতদাস ভাবনাগুলো
এখন রোমের কলোজিয়ামে আত্মঘাতি যুদ্ধে
হারলে মরবে, জিতলেও মরবে অন্য কোনদিন।
সময় পেলে একটি কবিতা লিখে রেখ
তোমার চোখের পাতায়, জিতলে পড়ে নেব।

একবারের কবিতা

নদি জন্মান্তরে বিশ্বাস করেনি
বয়ে চলে একমনে
একটিই জন্ম তার কবিতার মত
কবিতার পুনর্জন্ম হয় না
নদির কাহিনিও মৃত্যুহীন
কবিতাও গীতাঞ্জলী–
অন্তরে অমৃতবানী নিয়ে আজন্ম অমর।
নদির সংগোপনে সমর্পণ দিনরাত্রি
সাগরের সুখ নদি ছাড়া কে জানে?
এ কবিতা একবারই লেখা যায়
নদিও সেটা জানে।
রাতে স্বপ্নের সান্তনায়
মানুষ ঘুম নিয়ে জাগে সাগরের মতো
সে স্বপ্ন একবারই দেখা যায়।
পাতাটি ঝরে গেলে
মাটিতেই ফেরে
মাটি ছুঁয়ে বলে,
আমি মাটিতেই ফিরলাম
চির চেনা ঠিকানায়।
পদ্মাবতীও নদির মতো পদবি পালটে
বিশ্বাসে সিঁদুর মেখেছিল গায়ে
একদিন পদ্মাবতী কবিতা হয়ে গেল
তার সিঁদুরের রঙে মাটি রঞ্জিত হয়ে লাল হল
দুঃখ হল চির রঙিন অমর কাব্য।
এদের কবিতা একবারই লেখা হয়।

কোমল অন্ধকার

অভ্যস্ত ছিলাম অন্ধকারে
সহজ অভ্যাসে অন্তরে বাহিরে
জেনে নিতাম কোন রাস্তায় আগুনের শোভাযাত্রা
কোন অন্ধগলিতে পারাবতের শবমিছিল
অন্ধকার বলে দিত চাঁদ চুরি করার কৌশল
ভালো মন্দ আদর অনাদরের ছায়াপথ।

যখন সেদিন আলোকরশ্মির কিছু কণা
আমার আকাশ ভেদ করল
ঝলমল আলোয় ভরল ঘর
আমি ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে গেলাম।

একসময় কোন অজুহাতে
তুমি আর আমার হাত ধরলেনা
আমি চলতে ভুলে গেলাম।
তুমি তোমার হাতের স্পর্শ ফিরিয়ে নিলে—
আমার অন্ধকার আরও কালো হল।

আমি একটি অবলম্বন খুঁজতে থাকি
আমি এক বিকল্প গান্ধারী খুঁজতে থাকি
যে নিজে অন্ধ থেকেও আমাকে আলো দেখাবে।
অন্ধকার যখন আরও কোমল হল
অন্ধকারই আমার চেনা স্পর্শ ফিরিয়ে দিল
আমার শরীরের দায়িত্ব নিল
আমাকে এখন রোজ স্নানঘরে নিয়ে যায়।

কিশোরীর ডুব সাঁতার

সাঁতার দিতে বলেছিলাম
এপার থেকে ওপার
—নয়ন, পারবে তুমি ?
—খুব পারি। দেখবেন ?
আমার গোলাপ দাঁতে কামড়ে
ডুব সাঁতারে হারিয়ে গেল
আমি শঙ্কায় দমবন্ধ অনেকক্ষণ।
একি কোন ভুল !
না কি
সাতরঙা প্রজাপতির খেয়ালী ইশারা ?

অনেক খুঁজেছি তাকে
ঢেউকে শুধোলাম
—নয়নকে দেখেছ তোমরা ?
চুপ করে থাকে ঢেউ, কথা বলেনা।
নদিকে শুধোলাম, কোথায় রেখেছ তারে ?
নয়নকে ফিরিয়ে দাও।
নদি বলল, সে তো আমার গভীরে।
নুড়ি পাথরে খেলা করে সে, খুঁজো না তারে।

মুঠো ভরা নুড়ি আর পাথর নিয়ে ভেসে ওঠে নয়ন।
নদি বলল, নয়ন ওদিকে যেও না।
আমি নয়নকে ছুঁতে চাইলাম
নয়ন হেসেই খুন।

খোলা চিঠি

লিখেই ফেললাম তোমার নামে
খোলা চিঠি
নেই সে রঙিন গোপন খাম
যেদিন তোমার ঠিকানা হারালাম
বিদায় নিয়েছে প্রজাপতিরা
বিদায় নিয়েছে তোমার দেওয়া ফুলদানিটা।
শূন্য ড্রয়ারে এখন কিছু মৃত শুঁয়ো পোকা
বোবা পেন ড্রাইভ
আর কিছু ডেট এক্সপায়ারি অ্যান্টিভাইরাস সিডি।
তোমার চিঠির মতো ওরা হাসতে পারেনা।

বিনোদিনী, আমি জানি তুমি এ চিঠি পাবেনা
ওরা তো পড়বে–
ওদের হাতে হাতে থাকবে আমার প্রতিবাদ পত্র
আমার নালিশ তোমার বিরুদ্ধে
মেনে নেওয়ার নতমস্তক ঝাপসা চোখ তোমার
বেদেনীর মত সাপের ঝাঁপি বয়ে চলা
আজীবন
হাতে পায়ে শিকল বেঁধেও
সুখ সুখ বলে শিবরাত্রি করেছ কত বিনিদ্র রজনী।

খোলা ট্রাক চেপে নারী ছোটে মিছিলে
দুধের শিশু ঘরে রেখে।
বুড়ো বাপ বলেছিল, বেটি তুই যা।
কার মিছিল জানেনা বিনোদিনী

ময়দান ভরে ওরা।
রোদ বৃষ্টি মাথায় ঘরে ফেরে বিনোদিনী।
এক বিষণ্ন সন্ধ্যা নেমেছে ঘরের চালে
একটা শঙ্কা বুকে–উঠোনে পা রাখে বিনোদিনী
ধুকধুক করে মন, সন্ধ্যায় কোন ভয়ে কাঁপে বুক?
দুধের শিশু কোথায়-কোনখানে?
ঘর সুনসান নির্জন স্তব্ধ, কেউ নেই, কোথাও নেই।

লুম্বিনী

লুম্বিনী মেসেজ করল, হাই।
কি করছেন এত রাতে?
নিউ ইয়ার্স পালন করছেন?
—ওহো, হ্যাপি নিউ ইয়ার।
কে তুমি? চিনতে পারছি না তো।

ভুলে গেছেন? আমি লুম্বিনী—ব্যাঙ্গালোরের ষোড়শী।
সম্বর্ধনায় ফুল হাতে মঞ্চে—
আমিও ছিলাম ভিড়ের চাপে এক কোনে।
ভেবেছিলাম ফিরে যাই।
আমাকে ডেকে নিলেন।
মোবাইল নাম্বার দিয়েছিলাম।
বলেছিলাম, সেভ করে রাখুন— আমি লুম্বিনী।
কল করবেন ফিরে গিয়ে।
আপনি সেভ করেননি।
কলও করেননি।
—সরি, লুম্বিনী।
আর সরি বলতে হবেনা। ভালো থাকবেন। বাই।
আলো নিভিয়ে লেপ টেনে দেয় নিউ ইয়ারের আকাঙ্ক্ষা।
মোবাইল বন্যায় ভাসছে উৎসবের শহর।
আমি এক নিরুপদ্রব ঘুমে ব্যস্ত হই ততক্ষণ।
একবার ভেবেওছিলাম,
লুম্বিনীকে বলি, ঘুমিয়ে পড়, বেশী রাত করো না।
একটি মোবাইল মেসেজের অপেক্ষায় লুম্বিনীও এতক্ষণে হয়ত ঘুমিয়ে।

অবিরাম স্রোতধারায়

আমি পথভোলা আজন্ম এক ব্রহ্মচারী
আনমনা এক আপনভোলা
আমি অমৃতের ফেরিওয়ালা জনমভর
জলপ্রপাতে স্নান করি
রাত্তিরে আকাশপানে চেয়ে তারার সাথে কথা বলি।

তল পাইনি কোনদিনও
দিঘির ভেতর বাঁধানো সিঁড়িটির
শুধু নেমে গেছি নিচে আরও নিচে।
যতই সে মালা গাঁথুক
ফুলকলি সে মন পায়নি কুলভূষণের কোনদিনও।
পান পাতায় মুখ ঢেকেছে
চোখের জলে অধোবদন রাধিকা
মন্ত্র পড়ে সাত পাঁকে ঘোরে
কুলভূষণের চারধারে–
'যদিদং হৃদয়ং মম
তদিদং হৃদয়ং তব'– অগ্নি সাক্ষী বেলপাতায়।

যতই আমি কাব্য লিখি, শিকল ভেঙে মুক্ত হবে বন্দিনী
পাঠক আমার খুঁজে বেড়ায় কোথায় আমি
আমার পাল ছিঁড়ে নৌকা ভেঙেছে মাঝ গাঙে।

অভয় দিয়েছে যখন আমি কলম হারিয়ে বিপন্ন
এরাই আবার আলো ধরেছে যখন আমি নিরুদ্দেশ
এরাই দিয়েছে পূর্বাভাষ– মাঝ সমুদ্রে সাইক্লোনের
যখন জাহাজ আমার টলমল টালমাটাল।

শ্রাবণের পরে

তবু সে দাঁড়িয়েই রইল
শ্রাবণের পথ চেয়ে জেনেছে আর ফিরবে না সে।
সন্ধ্যা নামবে একটু পর।
সঙ্গিনীর ছাতাটি ধরেছিল শ্রাবণ ধারায়
মিনতি ছিল, উন্মাদনা ছিল
বৃষ্টি নেমেছিল অঝোরে।
তুলির জল রং চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছে সেদিন।

একখানি আঁধার নেমেছিল মেঘ বেয়ে
বাসর রাত যেমন সন্দেহবাতিক পূর্ণিমা।
একসময়ে—
হাতে হাত ধরা সে প্রতিজ্ঞার বাগান লুঠ হয়
বুকের পাঁজর ভাঙে নীল ব্যথায়
আকাশ হয় ঘনকালো
চির চেনা পথ অচেনায় পা বাড়াল
উর্বশীর বিজ্ঞাপনে ঢাকা পড়ে দিগন্ত।

ছোট্ট একটা ফাটল ধরেছিল সেতুর অন্তরে
ফুলের কোরকে কালো পোকা বাসা বেঁধেছিল
একসময়ে দু'জনের সেতুটি ভেঙেই পড়ে।

আজ শতাব্দীর পর
নদিটি শুকিয়ে গেছে,
ক্যানভাসে ধুলোর আস্তরণ
জল নেই, শিকড় গজিয়েছে নদির বাঁকে বাঁকে

মাটির বাঁধন আলগা হয়েছে অন্তরে
ভাঙা সেতুটির দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।
যদি শ্রাবণ আসে আর একবার
যদি মুষলধারায় বৃষ্টি নামে
কথা আর কাকলির অবগাহনে
আবার এক স্বপ্ন ছাতার নিচে
কথা হবে
যে কথা বলা হয়নি সেদিনও।

অনিশ্চয়

অবিশ্বাসেই সে এগিয়েছে সম্মুখে
শ্লীল অশ্লীল জানত না সুতপা
এক অনিশ্চয়তাকে রেখেছিল প্রথম পঙক্তিতে।
জানত না সুতপা– গোলাপে সুগন্ধ না কাঁটা।

দেখেওনি কোনদিন তাকে
তবু কাঁটাবন পেরিয়ে এসেছিল অচেনা গোলাপ বাগানে।
স্পর্শে আগুন না প্রেম– জানত না সুতপা
তবু ছুঁয়েছিল তাকে।
চোখে লালসা না মমতা– ভেবেছিল বার বার
সে পড়তে পারেনি চোখের ভাষা
চোখে চোখ রাখার সাহস হয়নি
পাছে আরও দুর্বল করে মন
তবু দিয়েছিল মন,
পায়ে পায়ে এভাবেই পথহারা কুমুদিনী।
সঁপেছিল প্রাণ
অনিচ্ছাতেই খুঁজে পায় নিশ্চিত অমাবস্যার যামিনী।

অবিশ্বাসই তাকে সাহস দিয়েছিল–
আঁধারেই উজাড় প্রাণে ভালোবাসা যায়–
সাপিনী আর ওঝার পোষমানা মন্ত্রে।

আস্থা জন্ম নেয় অবিশ্বাসের জরায়ুতে
সময় আর চাওয়া পাওয়ার প্রশ্ন শেষে
প্রেম জন্ম নিয়েছিল অপ্রাপ্তির সাধনা ঠোঁটে মেখে।

সুতপা হাতে হাত নিয়ে বলেছিল,
যেদিনই তোমাকে পাব
সেদিনই জেনো তোমাকে হারাব।

কবি যখন ঈশ্বর

কবিকে প্রশ্ন করলাম
কবি তুমিও কি ঈশ্বর ভাবছ নিজেকে?
কবি একটু মুচকি হাসলেন
অবিকল আদিম ঈশ্বরের মত সে হাসি।
ওহে কবি, ঈশ্বরের মতোই দুর্বোধ্য তুমি।
এবার ঈশ্বরের মত মৌন হলেন কবি
পাড়ায় কানাঘুষো শুনেছি–
তুমি স্বর্গেও যাও
নরকেও যাও
দুটোতেই তোমার অবাধ বিচরণ।
লোক জানাজানি হতেই বল–
কবি আর কৃষ্ণের সবেতেই ছাড় আছে।
তোমার কবিতাও রঙিন খোলসে জড়ানো
চাঁদ যেমন ঘন ঘন রূপ বদলায়
কখনও ঝলসানো রুটি
কখনও বা প্রিয়ার মুখ।
ঈশ্বরের মন্দির তালা বন্ধ!
ভক্ত মাথা ঠোকে মাটির ধুলোয়
লোহার তালায় সিঁদুর মাখে
সাধ পূরণের সুতো বাঁধে লোহার দরজায়।
তুমিও ছিটকিনি খোল না।
কাছে পেতে চাইলেই কবি, তুমি নির্বিকল্প
তোমার ললাটে আঁকা পুনর্জন্মের দাগ
তোমার শরীরেও বিষকন্যার বিছানা পাতা।

একটি দিনের অবসানে

সর্বজনীন সন্ধ্যা খসে যায় নিঃশব্দে
একটি একটি করে
পায়ে পায়ে।
ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে
এমনি করে আমাদের স্মৃতিরাও ইতিহাস হয়ে গেল।

আহত সিংহেরও একটা ইতিহাস লেখা যায়
অমৃত বৃক্ষের শিকড়ে বাগান রচনা হয়
নিঃসঙ্গ বিশল্যকরণীর জীবনদায়ী সংলাপ শোনা যায়–
উন্মন বঞ্চনায় ধূপের গন্ধও চিরস্থায়ী হয় না।

আমাদের যুগল ছবি হল ধুলোর আস্তরণে বন্দি
স্টোর রুম তখন ঘুমের নিরাপদ আশ্রম।
পুরাতনীর তালিকায় সেখানে তোমার
আদুরে খুনসুটি লেখাগুলোও আছে
আমার দু'একটি কবিতাও খুঁজে পাবে,
ধুলো ঝেড়ে দেখো রাত জ্যোৎস্নায়
আঁধারের জোনাকির মত জ্বলছে হয়ত।

রাতের ঘুমের সাথে যবনিকা নামে
আমাদের খুঁজে ফেরা।
রাত পোহালেই দৈনন্দিন উৎসব
সুনিদ্রায় তারিখ বদলায়–
আবার খুঁজতে থাকি

দু'জনে দু'জনারে
অন্য কোনও প্রভাতে।
বটের ঝুরির মতো শীর্ষাসনে ঝুলে থাকি
পর প্রজন্মের মাটির কাছাকাছি
মাটির গন্ধে আর একটি দিন বেশি পাব বলে।

গতি

অনেক ভোরে ঘুম ভেঙেছে আজ
দিল্লির উড়ান ধরতে হবে
নয়াদিল্লির সভাঘরে মিটিং
ভেবেছি আজ রাতে তোমার পৃথিবীতে ফিরবই।
কত ভোর এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে
মর্মান্তিক ভাবে হারিয়ে গেছে কত রূপসী সকাল
গতির কাছে হার মানতে হয়েছে আমাকে।
সেই সে ঘুম—
ছাত্রবেলার ভোরের প্রিয় ঘুম কতদিন ঘুমোই না
বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকা।
ছেড়ে গেছে পাশবালিশ আঁকড়ে থাকা অঝোর ঘুম
তোমার স্বপ্ন দেখা অভিমানে ঘর ছেড়েছে
প্রতি রাতের অস্থিরতায়।
মোবাইলে তখন কর্কশ এলার্মে কাঠবিড়ালির চিৎকার।
ব্যস্ত শহর ঘুমিয়ে থাকে
হু হু শব্দে বাতাস কেটে চলেছে গাড়ি।

হাতছানি শব্দের
হাতছানি গতি আর আলোর।
রানওয়ের বুকে দূরন্তের লক্ষ্যে ছুটবে
পৌঁছে দেবে আমাকে পৃথিবীর ব্যস্ত ঠিকানায়
গোপন দুঃখ রুমালের ভাঁজে রেখে এসেছি।
ফেলে এসেছি চুড়ির রিনিঝিনি আর চুলের গন্ধ।

আজ দুপুরে ভুলে থাকব তোমাকে
ভুলে থাকব আজ জমাট কবিতা লেখার বাসনা
কত ভোরের ঘুম গিয়েছে বিসর্জনে
কত রবিবার এভাবে সমর্পণ করেছি গতির পদমূলে।

মিষ্টি মউ

কথা আর হাসিতে ঝরঝর ঝর্ণা
মুক্তো ধরে রাখত ঝিনুকের বুকে
মিষ্টি মউ একুশে পা রেখেছে এবার।
ওকে পুকুর পাড়ে নিয়ে গেল সকলে

উলুধ্বনিতে সারা গায়ে হলুদ মাখা স্নান
মউ পুকুর জলে নিজের ছায়া দেখে
দেখল ভরা শ্রাবণে বৃষ্টি ভেজা এক কদম ফুল গাছ।

মুক্তো ঝিনুক আর ঝর্ণা ঝরে পড়ল জলে
মাছরাঙা পাখিটি চেনা পুকুরের ঠিকানা হারিয়ে ফেলল।
শরীর আর হৃদয়ের ভাঁজে তাজা একটা ফুল ছিল
চাঁদের অর্ধেক ভেঙে পড়ল ঘরের মশারি ছিঁড়ে
ফুলটা পিষে মরল শরীর শয্যায়।

স্বামী কখনও দার্শনিক
রাত বারোটা পর্যন্ত অফিসের কাজ
কখনও বাঁধা পশু শিকারি
কখনও প্রাচীন রোমের সেনানায়ক
কসরত আর বাহাদুরি মউয়ের সাথে।
মউ শুয়ে থাকে নিস্তরঙ্গ।

মউ এখন এক পূর্ণ রমণী
মউয়ের হাতে উঠল সোনার বালা

মউ বলল, এ তো বালা নয়, হাতের শিকল।
ঝুল বারান্দায় বৃষ্টির জলে ভিজতে মানা।

মউয়ের গলায় পরাল সোনার হার
মউ বলল, পরমেশ্বর আমার শ্বাস বন্ধ করে দিওনা।
মউ যেন বালতিতে তোলা স্নানের জল
যেমন খুশি গায়ে ঢালো
কলতলার রমণী কখনও মুখ ফেরায় না।
মউ জেনেছে—
শয্যা গ্রহণের আগেই প্রসাধনী।
—শরীর প্রস্তুত জাঁহাপনা।

মউয়ের রাঙা পায়ে রুপোর মল।
জল ফড়িঙ বসে মউয়ের ফর্সা পায়ে।
নদি আজন্ম স্বচ্ছ বসনা স্বেচ্ছাবাসী নারী
মউয়েরও নদি হতে ইচ্ছে জাগে—
কত নাবিক পাল ছিঁড়ে হাল ভাঙে
মউ সব বুঝতে শিখেছে।

আদেশ হল—
এবার থেকে কথা কম, কম হাসি
তোমাকে সন্তানের জন্ম দিতে হবে।
প্রশ্ন করবে না এত।
        ঈশ্বরের নিষেধ আছে।
মিষ্টি মউ অবাক চোখে প্রশ্ন করে—
কোন সে ঈশ্বর, কার ঈশ্বর?
নিবাস কোথায় তার?

খেয়ালি মন

কেন অবসাদ
দিন শেষে
সারাদিন ছিলাম নক্ষত্রের সমাবেশে
তীক্ষ্ম আর অব্যর্থ ছিল শব্দবাণের রেষারেষি।
ক্লান্তি না ছুঁয়েও
তৃপ্তি ও শক্তি হরণ করে ছিল হাই হিল তন্বী
পরিপূর্ণ অন্দরমহলেও দেখেছি প্রচুর তৃষ্ণা।
থরে থরে সাজানো খাদ্য ও সমৃদ্ধ বিদেশী গ্লাস
তৃষ্ণা ও খাদ্যের মধ্যে উঠতি কিশোরকে শোভা পায়
সেখানে আমার মত মধ্যবয়সী বেমানান।
পশলা পশলা কবিতা লিখেও
কত কথা বাকি রয়ে গেল!

ভরা নদির কত অহঙ্কার, কত পাওনা
কানায় কানায় পূর্ণ হয়েও
আরও চাই আরও চাই
পাড় ভেঙে সর্বগ্রাসী।

সে নদিও ক্লান্ত হয়ে
আমার মত ঘুম চায়
দিনশেষে।
কৃষ্ণপক্ষে অতৃপ্তি বাসা বাঁধে রক্ত পূর্ণিমার বাসনায়।
এই ক্লান্ত নিস্তেজ শরীর
এই খেয়ালি মন
আগামী ভোরে আবারও যুদ্ধ কামনা করে।

সংসার সিঁড়ি ও মরুভূমি

মরুভূমি তুমি কোনদিনও নারী হতে পারবেনা
নারীমন সাঁতার কাটে শান্ত স্ফটিক জলে
স্ফটিক জল তার আনন্দ আশ্রম
জলের ঢেউই তার পুজোর ফুল।

বাড়ির পোষা বিড়ালটি কোলে লাজুক কিশোরী নারী হয়
গাছে ফুল ফোটে, পাখি গান গায়
বিয়ের তত্ত্ব সাজানোর ধুম লাগে পাড়ায়
বিরহ বার্তাও পোঁছে যায় হলুদ টিয়ার ঠোঁটে
প্রেমিকার ছবি বুকে চেপে রয় কিশোর বালক।
কনে চলে বিয়ের সাজে।
বিয়ের পিঁড়িতে অশ্রুভেজা চিঠি লেখে ষোড়শী
— আমি এখন পূর্ণ নারী, সংসার আমার সিঁড়ি।
অপেক্ষায় থাকে নারী ঝড়ে রোদে আগুনে
বালুর উত্তাপ মাখে সারা শরীরে।
মরুভূমি তুমি কোনদিনও নারী হতে পারবেনা
তোমার সকল বালুকণা অবুঝ।
অধৈর্য হৃদয় হয়ো না তুমি
মরুভূমিতেই বৃষ্টি আনবে নারী।

ভ্যালেন্টাইন ও বইমেলা

রুক্মিণী বলল, জানো কিছু?
খবর রাখ?
এবার পাঠক কম লেখক বেশি
খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি
লেখকরা সব ঠাঁসাঠাসি
অনেক পাঠক পথ ভুলেছে
চপের দোকানে ভিড় করেছে।
বই মেলাতে বই ছিল কাড়িকাড়ি
চিকেন পকোড়া আইসক্রিমেরও মারকাটারি।
বইমেলা সাঙ্গ হলে পরদিনই ভ্যালেন্টাইন
ফেব্রুয়ারির চৌদ্দো—বিরাট লম্বা ফর্দ।

শুনেছ, কি বলছে ওরা?
ভ্যালেন্টাইনের দিনে হবে হুড়োহুড়ি
লাল গোলাপ আর পানীয়ের হবে ছড়াছড়ি।
যাবে নাকি গঙ্গার ধারে
বিকেল বেলা
মিলেনিয়াম পার্কে?

গঙ্গা কেন?
গঙ্গা মানেই কবিতা
গঙ্গার স্রোতে থোকা থোকা ভ্যালেন্টাইন।
আলু কাবলি ফুচকা আর
খোলা আকাশে হীরের খনি

ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে
সারা পিঠে উল্কি আঁকা নীল তরুণী
কক্রোচ আর স্করপিও
ওদের পায়ের নিচে আস্ত একটা জন্মভূমি।
নিচু গলায় রুক্মিণী—
যাবে নাকি?
সন্ধ্যাবেলা ঝোপে ঝাড়ে
গঙ্গার পাড়ে
আলো আঁধারি?
—এই বয়সে?
—ভ্যালেন্টাইনে কেউ বয়স মানে?

সম্রাট

মনটাই শুধু নিরঙ্কুশ দখলদারিতে
অন্য কোনও কিছুতেই অধিকার নেই আমার
যত সাপ লুডো খেলা মনেরই সাথে
কখনও মগডালে, কখনও শূন্যের হাহাকারে।

যদি জীবনে সম্রাট হতে চাও
সাজিয়ে নাও সাম্রাজ্যের ময়ূর সিংহাসন
মনের সর্বগ্রাসী রাজ দরবারে।

কুঞ্জ সাজাও সুমেরু কুমেরু ছাড়িয়ে
লক্ষ কোটি প্রজা তোমার
যত ফুল যত সুবাসিত পরাগ রেণু
যত ভাবনা রঙিন ডানায় ছড়িয়ে দাও
উড়ুক নিঃসীমে।
ঘাস জলে পা ডুবিয়েও
যদি ভাবো বৃন্দাবন মন তোমার
হাজার গোপী ব্যাকুল অপেক্ষায়
যদি ভাবো শাখায় শাখায়
নিলাজ শুকপাখিরা
কৃষ্ণের সাথে বাঁশীতে দোলে
একলা রাধা তখন ফুঁপিয়ে কাঁদে
চোখের জলে নিশ্চুপ দোলনায়
জানবে তখনই তুমি সম্রাট।

প্রাণহীন নুড়ি পাথর

সেদিন শীতের সকাল।
কুয়াশা ভোর নিয়ে বাস ভর্তি দঙ্গল ছেলে মেয়ে
আকাশটা টেনে পৃথিবী মুড়ে দেওয়ার শক্তি ছিল আমাদের।
কলেজের পিকনিক দল ছেড়ে পালিয়ে চার বন্ধু
খেয়াপারের পাটনির বারান্দায় মাদুর পেতে আড্ডা
পাটনির বউয়ের রান্না—
মাছের ঝোল আর গরম ভাতের কার্নিভাল।
সেই সন্ধ্যায় নন্দিনীকে বলেছিলাম
নন্দিনী, তুই আমার বুকের বা দিকে হাত রাখ।
বুকে মাথা রেখেছিল নন্দিনী
বলেছিল, তোর হার্টবিট শুনছি।

অবহেলার ছেলেবেলায়
খোঁজ রাখিনি, কে কোথায়
ভাবতাম, ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের স্মৃতিশক্তি আমার
কাউকে ভুলব না।

অন্তহীন ভুলচুকের অলিগলি ছিল আমার দিনগুলো
বাঁক নিতে নিতে থেমে গেছি কতবার
অন্য পথে পা রেখেছি
কখনও।
নদিতলের শুকনো মাটি খুঁড়েছি
একটু জল পাব বলে—
পেয়েছি প্রাণহীন নুড়ি পাথর।

ভেবেছি, ওই তো ওরা
হাতড়েছি শুধু অন্ধকার।
ছেঁড়া মলাটের ভিতর
পাণ্ডুলিপির পাতা চেয়ে থাকে
কাটাকুটি হিজিবিজি ধুলোয় ভরা জীবন।

আজ এবেলায়
চশমার ঝাপসা কাঁচে কবিতার ছলনায় টুকরো ব্যথা
ইতিহাস লেখা হবেনা কোনও
শরৎবাবুর উপন্যাসেও ঘর নেই নন্দিনীর।
হারিয়ে যাওয়া বন্ধু সোস্যাল মিডিয়া চেনেনা
সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত চেনে শুধু
সময় আর সংসারের ভার বইতে গিয়ে হয়ত
ভুলে গেছে আমার প্রিয় নাম।

রথীন বইমেলায়

একটা টিনের বাক্সে ঘুমোয় ওর কবিতারা
ন্যাপথলিন আঁকড়ে ধরে
কবিতার সুগন্ধরা পাড়ি জমিয়েছে
সবাই ছেড়ে গেছে সেই কবে।

তোমরা নন্দিনীকে দেখেছ কোন সান্ধ্য বাসরে?
নন্দিনীর এলো চুলে নাক গুঁজে শুঁকে দেখো একবার
পারফিউমের ভিড়ে এখনও কবিতার স্পর্শ লেগে আছে।

দাঁড়াও হে পাঠক
ক্ষণিক দাঁড়াও
বইমেলার স্টলের বাইরে
জীর্ণ শীর্ণ মানুষটি
কাঁধে ঝোলা ব্যাগে বই বিক্রি করে।

রথীন কবিতা লেখে এখনও
কবিতা ওর প্যাশান, ওর কৃষ্ণকলি
মলাটের চমক নেই
ওর ললাটে দুই রঙের বলীরেখা—
নীল রঙ ওর নন্দিনী
কালো রঙ ওর কবিতা কৃষ্ণকলি।

প্রিয় পাঠক,
বইয়ের ভাঁজে রথীন সাজিয়ে রেখেছে না বলা যন্ত্রণা
একশো টাকায় ওর একখানি ব্যথা কিনে নিও
বইমেলায় ওর বইয়ে পাবে—
ব্যথা আর যন্ত্রণার বিনুনি।
তোমাদের এক ঝলক দৃষ্টিতে কথা কইবে ওর কবিতা।
এবারও পুরোনো বাক্স খুলেছিল রথীন।
নন্দিনী ছেড়ে গেছে ওকে
লেখা ছাড়েনি রথীন।

গ্লেসিয়ার পর্বতে

(সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ, ১৮ই জুন ২০১৮)

সুইজারল্যান্ডে গ্লেসিয়ারের পর্বতে
রোপওয়ে বেয়ে বেয়ে উঠেছি উপরে
উঁচু উঁচু পর্বত পেরিয়ে
শিহরণ শরীরে মন কাড়া ইউরোপ সফরে
বরফে মোড়া সব চারিধার
সাদা সাদা মেঘ ছোঁয়া গ্লেসিয়ার।
জ্যাকেটও মানেনা ঠাণ্ডা
মাইনাস তেরোতে তিন জন কাঁপছি।
বরফ হাতে খেলছে ছুঁড়ছে আকাশে–
–এলিনা।
দীপাও মুঠো মুঠো বরফে–বরফের পাহাড়ে
কখনও বা রোলার কোষ্টারে পাহাড়ের চুড়া বেয়ে ছুটছি
আমিও আনন্দে চিৎকারে বলে উঠি
এত মজা বরফের এ দেশে
ফিরব না আমি আর, রয়ে যাব বরফের মায়াতে।
–ইয়েস স্যার, ডোন্ট গো।
–স্টে হেয়ার ইউথ আস।
– বলেছিল এলিনা হাসতে হাসতে– যেও না, থেকে যাও।
থেমে গেল বরফের সে খেলা
কি যেন অভিমান গ্লেসিয়ার বাতাসে।
সম্বিতে হেসে ওঠে তিনজন
নীরবতা ছাপিয়ে।

রুমাল

(ইউরোপ ভ্রমণের স্মৃতি, ১৬ই জুন ২০১৮)

চিত্ত আমার হঠাৎ কেন
আজ সকালে নিরুদ্দেশ।
শান্ত ঢেউয়ে শীতল ছিল
সাগর পাড়ের বালুকণা
সেই তো বেশ।
রঙিন তোমার রুমাল খানা
রুমাল তো নয় ভাঁজ করা চাঁদ
পেয়েছিলাম সেই দুপুরে
প্যারিসের ডিজনিতে।
অবশেষে ফিরিয়ে দেওয়ার
অজুহাতে আবার দেখা।
বলেছিলে, রুমাল খানা রেখে দিও
স্মৃতি চিহ্ন এলিনার।
ফিরে পেলাম চাঁদের সাথে তোমাকেও
প্যারিস বন্ধু এলিনা।

আজও আমার স্মৃতিতে
সেই সেদিনের হঠাৎ দেখা
সোনালি চুলের এলিনা।
ডিজনি ওয়ার্ল্ডের টাফ রাইডে
বসেছিল আমার পাশে।
কফি শপ
থ্রি ডি মুভি

খোলা ট্রেনে ডিজনি রাইড
আইফেল টাওয়ার
প্রাপ্তবয়স্ক রাতের প্যারিস
লিডো শোতে শ্যাম্পেন বোতল।
—চিনিয়ে দিলে
—চিনিয়ে নিলে
সব অচেনার রহস্যে
প্যারিস থেকে ইতালির ভেনিসে
বন্ধু তুমি এলিনা।

আজ হঠাৎ দেখি ওয়ারড্রবে
উঁকি দিচ্ছে রুমালখানা
সেই সে রুমাল
গন্ধ নিলাম
হাতের মুঠোয় বন্ধু তুমি এলিনা
চিত্ত তাই চঞ্চলা
এই সকালে আনমনা।

ঘৃণা

(নিউজিল্যান্ডের বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে)
১৬/৩/২০১৯- দিল্লি

উন্মুক্ত তরবারির মত তীক্ষ্ণ হোক আমার ঘৃণা।
একমাত্র এ পৃথিবীর মাটিতে আমাদের শয্যা পাতা,
আর কোথাও নিবাস আছে কিনা জানিনা।
মগজে শুধু কাক চিল শকুনের আনাগোনা
মহল্লায় মহল্লায় অন্ধকার গলিতে মন এখন মৃত পশু
জলপাই পাতায় নরমুণ্ডের ছবি এঁকে যায় কে বা কারা
রক্তের ধারায় আর কত পৈশাচিক স্নান?
নগ্ন উল্লাস আমি দেখতে পারিনা।
ভাইরাল ভিডিও হৃদস্পন্দনে থাবা বসিয়েছে।

বিষবাষ্পে আমার দমবন্ধ কষ্ট
পৃথিবীর জঠরে চাপ চাপ আতঙ্ক।
আসন্ন প্রসবা জননী প্রশ্ন করছে,
একটি নিশ্চিত পৃথিবী দেবে তোমরা?
সেখানে শান্ত সূতিকাগৃহে জন্ম দেব সন্তান।
একটি ছোট্ট পারাবত আমার প্রসব যন্ত্রণা ভোলাতে আসবে।
আমার সন্তানের মাংস খুবলে নেবেনা কোন শৃগাল।
বুলেটের কলঙ্ক দাগ থাকবেনা প্রার্থনার দেয়ালে।

ছিন্নপত্রে

নন্দিনী হঠাৎ এল
এলোকেশী শুভ্র বসনা
কি যেন বলতে চাইল
তবু বলল না।
কি যেন শুনতে চাইল
শোনাতে পারলাম না।
আমিই বললাম, তুমি হঠাৎ?

এক ছিন্নপত্রে
নন্দিনী লিখে রেখে গেল—
আমি তোমার অসময়ের দ্রৌপদী
আমি তোমার সতী সীতার পঞ্চবটী বন
আমি তোমার আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিওপেট্রা
আমি হতে চাই রাধা নামের কৃষ্ণ বাঁশি
হতে চাই ওথেলোর ডেসডিমনা
আমি মরতে চাই তোমার কবিতার শেষ চরণে
জুলিয়েট যেমন স্বপ্ন দেখে
রোমিওর বুকে মাথা রেখে
আমি বাঁচতে চাই মরণের পর তোমার লেখা গীতিকাব্যে।
নামটি আমার লিখে রেখ তোমার কাব্যের দু'চরণে।
তোমার সুহৃদ পাঠক যারা
নন্দিনীকে মনে রাখবে আজন্মকাল
তোমার লেখা গানে কবিতায়।

'জনারণ্যে পদাতিক' ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাসের চতুর্থ গ্রন্থ। এর আগে 'ফিরে আসা' ও 'জেগে আছি' দুটি কবিতা গ্রন্থ ও 'মিশর - মমি পিরামিড ও নীলনদের দেশে' ভ্রমণকাহিনি পাঠক মহলে বিশেষ আদৃত হয়।

চিকিৎসা পেশা, সাংগঠনিক, সামাজিক কাজকর্ম ও দায়িত্বের মধ্যে থেকেও তিনি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি প্রভৃতি লেখায় সবসময়েই যত্নবান থেকেছেন।